দৈনিক বণিক বার্তা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
পত্রিক

1 1 MAY 2017

ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (ডিসেম্বর ২০১৬)

বড় গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকঋণ আরো বেশি কেন্দ্রীভূত

হাছান আদনান ■

জনগণের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য সারা দেশে ব্যাংকঋণ সুবিধা ছড়িয়ে দেয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। উদ্যোক্তা তৈরিতে ছোট ছোট ঋণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকও বিভিন্ন সময় ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও বড় গ্রাহকদের কাছে আরো কেন্দ্রীভূত হয়ে যাচ্ছে ব্যাংকঋণ।

২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে বড় গ্রাহকদের প্রতি আরো বেশি ঝুঁকে পড়েছে ব্যাংকগুলো। শুধু তিনজন শীর্ষ গ্রাহকের কাছে নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিয়েছে দেশের ২৩টি ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের গত বছরের ডিসেম্বর প্রান্তিকের ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট বা আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে।

দেশের ৫৬টি ব্যাংক থেকে পাওয়া ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বিভাগ। প্রতি তিন মাস পর দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি সহনক্ষমতা পরিমাপ করে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনের তথ্যমতে, শীর্ষ তিনজন গ্রাহক খেলাপি হলে ঝুঁকিভারিত সম্পদের বিপরীতে মূলধন (সিআরএআর) সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হবে ২৩টি ব্যাংক। আর শীর্ষ সাতজন গ্রাহক খেলাপি হলে ৩৩টি ব্যাংক এবং শীর্ষ ১০ জন গ্রাহক খেলাপি হলে ৩৭টি ব্যাংক সিআরএআর সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। ফলে মূলধন হারিয়ে দেউলিয়ার পথে হাঁটবে দেশের অর্ধেকের বেশি ব্যাংক।

> শীর্ষ তিন গ্রাহক খেলাপি হলে ঝুঁকিভারিত সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হবে ২৩টি ব্যাংক

২০১৫ সালের ডিসেম্বর শেষে শীর্ষ তিন গ্রাহক খেলাপি হলে সিআরএআর সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল ২১ ব্যাংক। আর শীর্ষ সাত গ্রাহক খেলাপি হলে ৩২ ব্যাংক এবং শীর্ষ ১০ গ্রাহক খেলাপি হলে ৩৫ ব্যাংক সিআরএআর সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল। এর এক বছর পরে এসে এমন ঝুঁকির তালিকায় নাম লিখেছে আরো বেশি সংখ্যক ব্যাংক। ২০১৬ সালে শীর্ষ গ্রাহকদের ওপর আরো বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে দেশের ব্যাংকগুলোর ভবিষ্যৎ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এ প্রসঙ্গে বণিক বার্তাকে বলেন, বড় গ্রাহকরা দেশের ব্যাংকিং খাতের বড় ঝুঁকি। কারণ ৫০ জন এসএমই উদ্যোক্তা খেলাপি হলে একটি ব্যাংক যতটুকু ঝুঁকিতে পড়ে, তার চেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়ে একজন বড় গ্রাহক খেলাপি হলে। যেসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেশি, সেসব ব্যাংকের মূলধন সংকটের ঝুঁকিও বেশি। তার মতে, দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হলে অর্থনীতিতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকে নজর দিলে দেশের বেকারত্ব সংকট নিরসনসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি সম্ভব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে ব্যাংকগুলোর সংকটকালীন সহনক্ষমতা পরীক্ষায় ঋণ, বাজার ও তারল্য ঝুঁকি পরীক্ষার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, খেলাপি ঋণ ৩ শতাংশ বাড়লে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে পাঁচটি ব্যাংক, ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে এক্ষেত্রে ঝুঁকির তালিকায় ছিল সাত ব্যাংক। আর খেলাপি ঋণ ৯ শতাংশ বাড়লে ২২টি এবং ১৫ শতাংশ বাড়লে ৩৫টি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। গত ডিসেম্বরে এক্ষেত্রে ঝুঁকির তালিকায় ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ৩২টি ব্যাংক।

প্রতিবেদনে বাজারঝুঁকির বিষয়ে বলা হয়েছে, সুদের হার ১ শতাংশ কমালে পাঁচটি ব্যাংক তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। গত ডিসেম্বরে এমন ঝুঁকিতে ছিল তিন ব্যাংক। ঋণের সুদহার ২ ও ৩ শতাংশ কমলে নয়টি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। আর ব্যাংক খাতের ইকুইটির মূল্য ১০, ২০ ও ৪০ শতাংশ কমলে তিন থেকে চারটি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে আরো বলা হয়েছে, ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতারা যেসব সম্পদ ব্যাংকের কাছে জামানত রাখেন, সে সম্পদের ১০ শতাংশ কমলে মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে দুটি ব্যাংক। একইভাবে ২০ ও ৪০ শতাংশ করে জামানতের সম্পদমূল্য কমলে যথাক্রমে দুই ও আটটি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণ করতে পারবে না। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে এমন ঝুঁকিতে ছিল যথাক্রমে দুই, তিন ও পাঁচটি ব্যাংক।

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপ রয়েছে— নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ ঋণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্রেস টেস্টিংয়ে বলা হচ্ছে, খেলাপি ঋণের ধাপ ৫ শতাংশ অবনমন হলে দুটি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণ করতে পারবে না। একইভাবে খেলাপি ঋণের ধাপ ১০ ও ১৫ শতাংশ অবনমন হলে যথাক্রমে আট ও ১৪টি ব্যাংক মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট খেলাপি ঋণের ৮৪ দশমিক ৩৫ শতাংশই মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে মন্দ মানের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫২ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা, যা আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বড় গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকঋণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ ছিল ৫১ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা, যা গত বছরের ডিসেম্বর শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকায়। একই সময়ে ব্যাংকগুলো অবলোপন করেছে ৪২ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকার ঋণ। সবমিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত ৫৬টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট বিতরণকৃত ঋণের ৯ দশমিক ২৩ শতাংশই গেছে খেলাপির খাতায়। অবলোপনকৃত ঋণ যোগ করলে এ হার ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। বিপুল পরিমাণ এ খেলাপি ঋণের ৫১ দশমিক ৮ শতাংশই মাত্র পাঁচটি ব্যাংকের। আবার মোট খেলাপি ঋণের ৬৬ দশমিক ৪ ভাগই ১০ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দেশের মোট খেলাপি ঋণের প্রায় অর্ধেকই রাষ্ট্রায়ত্ত পাঁচটি ব্যাংকের। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের ১০ হাজার ২২৯ কোটি, বেসিক ব্যাংকের ৭ হাজার ২২৯ কোটি, অগ্রণী ব্যাংকের ৫ হাজার ৮৭৭ কোটি, জনতা ব্যাংকের ৪ হাজার ১৬৫ কোটি ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ৪ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ রয়েছে। এক্ষেত্রে শীর্ষ এ পাঁচ ব্যাংকের মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৩২ হাজার ১৮০ কোটি টাকা।

এ বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত বলেন, বড় ঋণগুলো পুনঃতফসিলের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ব্যবসা খারাপ হওয়ার দোহাই দিয়ে বড় গ্রাহকরা এ সুযোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সুযোগ নিয়েও বড় গ্রাহকরা ঋণখেলাপি হয়ে গেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়েই এমনটি করছেন তারা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় কঠোর হলে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমে আসত। কারণ ব্যাংক নিজ ক্ষমতাবলে তিনবারের বেশি কোনো ঋণ পুনঃতফসিল করতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রভাবশালীরা ব্যাংকের ওপর চাপ দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে চতুর্থ বা পঞ্চমবারের মতো ঋণ পুনঃতফসিলের জন্য আবেদন করাচ্ছেন। কিছু টাকা দিয়ে ঋণ পুনঃতফসিল করা হলেও কিছুদিন পরেই তারা আবার খেলাপি হয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশের শীর্ষ পাঁচটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের ৩২ দশমিক ২ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে শীর্ষ পাঁচটি ব্যাংকের হাতে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে এ ব্যাংকগুলোর কাছে সম্পদের হার ছিল সাড়ে ২৯ শতাংশ। এছাড়া ডিসেম্বর শেষে দেশের শীর্ষ ১০টি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি: ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর শেষে দেশের ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (এনবিএফআই) অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে দেশের মাত্র চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিরাপদ অবস্থানে (গ্রিন জোন) ছিল। গত ডিসেম্বর শেষে গ্রিন জোনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচটিতে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইয়েলো ও সাতটি প্রতিষ্ঠান রেড জোনে রয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা বলেন, দেশের ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি ও চাপ নেয়ার সক্ষমতা যাচাই করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন তৈরি করে। প্রতিবেদনে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে। কিছু কিছু সূচকে দেশের ব্যাংকিং খাত উন্নতি করেছে। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়মিতভাবে দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি কমানোর জন্য ঋণের বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
আর্থিক বিশ্লেষণ ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

দৈনিক সকালের খবর

তারিখ ঃ 1 1 MAY 2017

শীর্ষ ১০ ঋণগ্রহীতা খেলাপি হলে মূলধন সক্ষমতা হারাবে ৩৭ ব্যাংক

কেন্দ্রীভূত ঋণ ঝুঁকিতে বেশিরভাগ ব্যাংক

আসাদুল্লাহিল গালিব ■

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ঋণ নীতিমালা প্রণয়নে তাগাদা রয়েছে। তা সত্ত্বেও ব্যাংকের সব ধরনের সেবা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এতে ব্যাংকগুলোর ঋণ ঝুঁকিও অনেক বেড়ে গেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, ব্যাংকের শীর্ষ ১০ ঋণগ্রহীতা খেলাপি হয়ে গেলে অন্তত ৩৭টি ব্যাংক তার প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। এতে মূলধন সক্ষমতার বাধ্যতামূলক হার ১০ শতাংশের পরিবর্তে ৬ দশমিক ৬৯ শতাংশে নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে।

দেশের ব্যাংকিং খাতের ঋণ নির্দিষ্ট কিছু গ্রাহক ও অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য ব্যাংকঋণ সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ ব্যাংকও বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে বড় বড় ঋণগ্রহীতার পরিবর্তে ছোট ছোট ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহ দিয়ে আসছে। তবুও ব্যাংকঋণের বহুমুখীকরণ সম্ভব হচ্ছে না, বরং গুটি কয়েক গ্রাহকের হাতে ঋণ আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ব্যাংকের শীর্ষ তিন ঋণগ্রহীতা খেলাপি হলে মূলধন সক্ষমতা হারাবে ২৩টি ব্যাংক, এতে মূলধনের হার দাঁড়াবে ৯ দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ। আর শীর্ষ সাত ঋণগ্রহীতা খেলাপি হলে প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে ৩৩টি ক, এতে হার দাঁড়াবে ৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ। আর শীর্ষ দশ ঋণগ্রহীতা খেলাপি হলে ব্যর্থ ব্যাংকের তালিকা ঠেকবে ৩৭টিতে, আর হার দাঁড়াবে ৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ব্যাসেল-৩ অনুসারে ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে ঝুঁকির বিপরীতে ১০ শতাংশ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন তৈরি করে। এর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়মিতভাবে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি কমানোর জন্য ঋণের বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণে বিভিন্ন প্রকারের ঝুঁকি থাকে। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকিভিত্তিক এ সম্পদের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হওয়ায় ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ অনেক বেড়ে গেছে। এতে রাষ্ট্রীয় খাতের বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত আট ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকগুলো মূলধন ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতে উদ্বৃত্ত মূলধন থাকলেও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সকালের খবরকে বলেন, বিপুল পরিমাণের খেলাপি ঋণ দেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলধন ঝুঁকিতে থাকা অধিকাংশ ব্যাংকই রাষ্ট্রীয় মালিকানার। এসব ব্যাংক ২৫ শতাংশ ঋণখেলাপি রেখে ঋণ বিতরণে সুদহার কমাতে পারবে না। বড় অঙ্কের ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে মূলধন সঙ্কটের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। যেসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেশি, সেগুলোর মূলধন সঙ্কটের ঝুঁকিও বেশি। ব্যাংকগুলো আমানতের সুদহার প্রত্যাশার চেয়েও কমিয়ে দিচ্ছে। এতে করে সামগ্রিকভাবে সাধারণ আমানতকারী ও গ্রাহক চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার অনেক ব্যাংক বিনিয়োগের গুণগতমান যাচাই-বাছাই না করেই নানান প্রেক্ষাপটের কারণে ঋণ বিতরণ করেছে। যা পরবর্তীতে ব্যাংকের জন্য বোঝা হয়ে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। এর সামগ্রিক প্রভাব ব্যাংকের সংরক্ষিত মূলধন ঘাটতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তবে ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার সময় প্রকৃত বিনিয়োগকারী কি না তা যাচাই করে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ কমিয়ে এবং পরিচালন মুনাফা বাড়িয়ে এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ব্যাংকগুলোতে যদি আরও তিন শতাংশ খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পায় তাহলে পাঁচটি ব্যাংক তার মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে। একইভাবে ৯ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ খেলাপি ঋণ বাড়লে যথাক্রমে ২৭ ও ৩৫টি ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণ করতে পারবে না। বিষয়টিকে অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ডিসেম্বর'১৬ শেষে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে রয়েছে ৩১ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যাংক ব্যবস্থায় বিতরণ হওয়া মোট ঋণের ৯ দশমিক ২৩ শতাংশই খেলাপি ঋণ। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় খাতের বেসিক ব্যাংকে ৫৪ দশমিক শূন্য চার শতাংশ, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে ৪৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ, সোনালী ব্যাংকে ৩১ দশমিক ৩৩ শতাংশ, অগ্রণী ব্যাংকে ২৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ, রূপালী ব্যাংকে ১৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং জনতা ব্যাংকে ১১ দশমিক ৪৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ।

সূত্র জানায়, ব্যাংকগুলোকে শ্রেণিকৃত ঋণ ও অন্যান্য সাধারণ ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে অর্থ সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংক ব্যবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের বিপরীতে অর্থ সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল ৩৬ হাজার ২০৯ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। এ সময়ে ব্যাংকগুলো সংরক্ষণ করেছে ৩০ হাজার ৭৩৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। সে হিসেবে ডিসেম্বর'১৬ প্রান্তিক শেষে ব্যাংকগুলোর প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা, যা তিন মাস আগে তথা সেপ্টেম্বর'১৫ শেষে ঘাটতি ছিল ৪ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, সুইজারল্যান্ডের 'ব্যাসেল' নামক স্থানে ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের (বিআইএস) সদর দফতর অবস্থিত। সারা বিশ্বের ব্যাংকিং খাতের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরা বিআইএসে বসে ২০০৪ সাল থেকে ব্যাংকিং খাতের জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিধান প্রণয়ন করে আসছেন। সে স্থানের নামানুযায়ী ব্যাংক খাতের আন্তর্জাতিক বিধানকে ব্যাসেল নামে নামকরণ করা হয়। বিশ্বের ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি কমাতে প্রথম পর্যায়ে-১ এবং ২০১১ সালের জুলাই থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাসেল-২-এর আলোকে মূলধন সংরক্ষণ শুরু হয়েছে। নিয়ম মেনে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে বর্তমানে ন্যূনতম ৪০০ কোটি টাকা অথবা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ—যেটি বেশি সে পরিমাণ অর্থ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল

তারিখ ঃ 1 1 MAY 201

বড় ১০ গ্রাহক খেলাপি হলে মূলধন ঘাটতিতে পড়বে ৩৭ ব্যাংক

সমকাল প্রতিবেদক

প্রতিটি ব্যাংকের বড় ১০ জন করে গ্রাহক খেলাপি হলে মূলধন ঘাটতিতে পড়বে ৩৭টি ব্যাংক। আর বড় ৭ জন গ্রাহক খেলাপি হলে মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ হবে ৩৩টি ব্যাংক। একইভাবে তিনজন করে গ্রাহক যদি খেলাপি হন তাতে মূলধন ঘাটতি হবে ২৩টি ব্যাংকের। এই চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদনে। গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

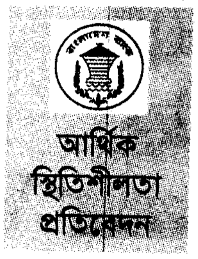

২০১৬ সাল ভিত্তিক এ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৫৭টি ব্যাংকে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ দশমিক ৮০ শতাংশ হারে মূলধন রয়েছে। ডিসেম্বর ভিত্তিতে মোট মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৩ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা। আর ডিসেম্বর ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোতে মোট খেলাপি ঋণ রয়েছে ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। বর্তমানের এ খেলাপি ঋণ তিন শতাংশ বাড়লে ৫টি, ৯ শতাংশ বাড়লে ২৭টি এবং ১৫ শতাংশ বাড়লে ৩৫ ব্যাংক মূলধন ঘাটতিতে পড়বে। এ ছাড়া বাজার, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন, সুদহার, তারল্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাংক খাতের মোট খেলাপি ঋণের মধ্যে ৩২ হাজার ১৮১ কোটি টাকা রয়েছে পাঁচটি ব্যাংকে। এ পরিমাণ খেলাপি ব্যাংক খাতের মোট খেলাপি ঋণের ৫১ দশমিক ৮০ শতাংশ। বাকি ৫২টি ব্যাংকে রয়েছে ২৯ হাজার ৯৯২ কোটি টাকা যা মোট খেলাপি ঋণের ৪৮ দশমিক ২০ শতাংশ। আর শীর্ষ ১০ ব্যাংকে রয়েছে ৪১ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। মোট খেলাপি ঋণের ৬৬ দশমিক ৪০ শতাংশ। আর ভয়াবহ তথ্য হলো মোট খেলাপি ঋণের ৮৪ দশমিক ৪০ শতাংশই মন্দমানে শ্রেণিকৃত। এ ধরনের ঋণ সাধারণ আদায় হয় না। সন্দেহজনক মানে রয়েছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। আর সাব স্ট্যান্ডার্ড বা নিম্নমানে রয়েছে ১০ দশমিক ২০ শতাংশ।

প্রতিবেদনে শীর্ষ খেলাপির তালিকায় থাকা ব্যাংকগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, খেলাপি ঋণের শীর্ষে থাকা ৫ ব্যাংকের সব কটি সরকারি মালিকানার। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে সোনালি। ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ১০ হাজার ২২৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ রয়েছে ৭ হাজার ২২৯ কোটি টাকা। পর্যায়ক্রমে অগ্রণী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ রয়েছে ৫ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা, কৃষি ব্যাংকে ৪ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা এবং জনতা ব্যাংকে চার হাজার ১৬৫ কোটি টাকা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক জনকণ্ঠ**

তারিখ ঃ 11 MAY 2017

ব্যাংকের জালিয়াতি ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা সংশোধন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ দেশের ব্যাংকগুলোর জালিয়াতি ঠেকাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা সংশোধন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার দেশের সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর কাছে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাংক ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঝুঁকি হ্রাস এবং জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক কার্যক্রম আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হলো।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

দৈনিক সংবাদ
পত্রিকার নাম ঃ

তারিখ ঃ 1 1 MAY 2017

ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধনের উদ্যোগ

ব্যাংকিং খাতের জন্য অশনিসংকেত

সব মহলের ক্ষোভ

রোকন মাহমুদ

ব্যাংক খাতের বিশ্লেষকরা বলছেন অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর, নীতিগতভাবে সম্মত নয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও, আইনের অপব্যবহার করে দুর্নীতি ও ঋণ নিয়ে খেলাপি হওয়ার প্রমাণও পাওয়া গেছে। তবুও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর পরিচালকদের সুযোগ বাড়াতে ব্যাংক কোম্পানি আইনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। একই পরিবার থেকে চারজন ও তিন মেয়াদে ৯ বছর পদ ধরে রাখার মতো নজিরবিহীন সুযোগ দিচ্ছে সরকার। সরকারি এ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করছেন অর্থনীতিবিদ ও অভিজ্ঞ ব্যাংকাররা। তাদের মতে, এটি বাস্তবায়ন হলে কাগজে-কলমে পাবলিক লিমিটেড হলেও বাস্তবে বেসরকারি অনেক ব্যাংকই হয়ে পড়বে প্রাইভেট ব্যাংক। কেননা ব্যাংকে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বাড়বে কুঋণ। বিশৃঙ্খল হবে পুরো ব্যাংকিং খাত। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এটি নতুন ব্যাংক দেয়ার মতোই আরও একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলেও মনে করছেন তারা। মূলত কিছু মানুষকে সুবিধা দিতেই সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারকে আবারও চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন এই বিশ্লেষকরা। এছাড়া আইনের সংস্কারের ধরন বদলানোর কথাও বলছেন অনেকে।

জানা যায়, সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ সংশোধিত ২০১৭'র খসড়া নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়। সংশোধিত আইনে কোন ব্যাংকে একই পরিবারের পরিচালক সংখ্যা ২ জন থেকে বাড়িয়ে ৪ জন করা হয়েছে। এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর বিল আকারে জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে। সেখানে পাস হলেই আইনটি কার্যকর হবে। ১৯৯১ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন পাস হওয়ার পর থেকে বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে

ব্যাংকিং : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ব্যাংকিং : খাতের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালকদের মেয়াদ সম্পর্কিত ধারাটি পাঁচবার সংশোধন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে ধারাটি সংশোধন করা হয়। বিদ্যমান ব্যাংক কোম্পানি আইনে ব্যাংকের পর্ষদে পরিচালকের সংখ্যা ৩ জন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ মোট ২০ জন থাকতে পারবে। আইনটিতে এ উপধারার ব্যাখ্যা দেয়া আছে এভাবে, পরিবারের সদস্য হিসেবে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই ও বোন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, এবারের সংশোধনের বিষয়ে ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদের নেতৃত্বে যে ব্যাংকিং কমিশন হয়েছিল, তাতে এক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ একজন সদস্য পরিচালনা বোর্ডে রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সরকার সংখ্যাটা দুজন করেছিল। কিন্তু সর্বশেষ তা চারজন করে খসড়া অনুমোদন দেয়া হয়। এছাড়া এই সংশোধনীর সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত নয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারাও। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্র বলছে, আইনের সংশোধনীর বিষয়ে প্রথম সুপারিশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ দুজন করার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া বিপক্ষে ছিল মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়েও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের সংশোধনী বৈঠকগুলোতে যোগ দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সুপারিশের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

সংশোধনীর খসড়া অনুমোদনের পর নীতিটির সমালোচনা করেছেন দেশের ব্যাংক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরাও। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাস উদ্দিন আহমদ সংবাদকে বলেন, 'অর্থনৈতিক খাতের আইনে সরকারকে মাঝে মাঝে সংস্কার করতে হয়। সেক্ষেত্রে দুইটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। একটি হলো পুঁজি আহরণ যাতে ঠিকমতো হয়। দ্বিতীয়টি হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেন পুঞ্জিভূত না হয়ে যায়। সরকার ব্যাংক কোম্পানি আইনে যে সংস্কার করেছে তার মধ্যে পরিচালকদের সংখ্যার বিষয়টি অন্যভাবেও করতে পারতো। তা হলো- চলমান বোর্ডের অনধিক ২৫ শতাংশ একই পরিবারের রাখা যাবে। স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবে এই হিসাবের বাইরে। সেক্ষেত্রে শেয়ারধারী পরিচালকের সংখ্যা যদি ১২ জন হয় তবে এক পরিবারের থাকতে পারতো তিনজন। চারজন রাখতে হলে বোর্ড হতো ১৬ জনের। তাহলে বোর্ডে পরিবারের সংখ্যা যতই হোক তাতে ভারসাম্য হতো। এছাড়া পরিচালকদের মেয়াদের বিষয়ে আমি সরকারকে আবারও বিবেচনা করতে বলবো। এটি ছয় বছরেই ঠিক আছে। ৯ বছর বেশি হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে দুই মেয়াদের বিরতির সময় কমিয়ে ১ কিংবা ২ বছর করা যেতে পারে। যা বর্তমানে তিন বছর রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, আমি মনে করি, পরিচালকের সংখ্যা দুইজনেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তাছাড়া একটানা ৯ বছর ওই পদে কারও থাকা নজিরবিহীন। এর ফলে গোটা কাঠামোটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। বোর্ডের বাকিরা নিস্পৃহ ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, বর্তমানে ৪০টি ব্যাংকে দেখা যাচ্ছে, মালিকদের টাকা ২ দশমিক ৫ শতাংশের সামান্য বেশি। সাধারণত বেসরকারি ব্যাংকে জনগণের টাকা থাকে গড়ে ৯০ শতাংশের ওপরে। এ জন্যই পরিচালনা পর্ষদে অংশীদারদের প্রতিনিধিত্ব ব্যাপকভিত্তিক করতে হয়। আমরা ব্রিটিশ ব্যাংকিং সিস্টেমে অনুসরণ করি, যেখানে বহুপক্ষীয় (ব্রড বেজড) বোর্ড থাকাই নিয়ম। এক পরিবার থেকে চারজন যদি ৯ বছর করে থাকেন, তাহলে বোর্ড সম্পূর্ণ পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। জনগণের কষ্টের টাকার সঞ্চয়ের সঠিক বিনিয়োগের সুযোগও কমে যাবে। এতে ব্যাংকের নাজুকতা বাড়বে। ব্যাংকের মালিকরা বেশি হারে পরিচালনা পর্ষদে থাকলে ব্যাংকের ভালো হবে, বিচক্ষণ বিনিয়োগ হবে; এমন দাবি যুক্তিযুক্তও নয়, বাস্তববাদীও নয়। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল, সর্বময় ক্ষমতাধররা বেশ কয়েকটি ব্যাংককে শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে গেছেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত অসুস্থ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। রাজনীতি যে দুর্বৃত্তদের অর্থনীতি দ্বারা প্রভাবিত, এটাই তার প্রমাণ। তিনি আরও বলেন, সারাদেশের মানুষ তাদের সঞ্চিত অর্থ, আমানত হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখে। আর ব্যাংকে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পুরো দেশের মানুষের সম্পদ কয়েকটি পরিবার মিলে লুটেপুটে খাবে। এর মাধ্যমে তারা ফুলে-ফেঁপে উঠে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তান আমলে আমরা ২২ পরিবারের কথা জানি। এই ২২টি পরিবার দ্বারা ব্যাংক ও আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রিত হতো। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২২টির জায়গায় হয়তো ৫০টি পরিবার হবে। এরাই পুরো অর্থ ব্যবস্থা জিম্মি করে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

জানা গেছে, ব্যাংকিং খাতের অসাধু পরিচালকদের লুটপাটের বিষয়টি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। এদের অনেকেই কোন নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে দীর্ঘদিন থেকে গ্রাহকের অর্থ লুটপাট করছেন। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকও। কিন্তু পরিচালকদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে শক্ত কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সেদিক থেকে কিছু লোকের কাছে দেশের ব্যাংকিং খাত ছিল জিম্মি। বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক, মালিকদের ইশারায় ঋণ দেয়া হয়। আবার ঋণ দেয়া বন্ধ করা হয়। যাকে পছন্দ ঋণ দেন। আবার যাকে অপছন্দ তাকে ঋণ দেয়া থেকে বিরত থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের লোককে ঋণ দেয়া হয়। একই ব্যক্তি নামে-বেনামে বারবার ঋণ নিচ্ছেন। এসব ঋণের বেশিরভাগই আর ফেরত আসছে না। হয়ে যাচ্ছে খেলাপি। এরপর অবলোপন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জুন পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৩০ হাজার ১৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯৩ হাজার ৪৫০ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছেন ব্যাংক মালিকরা, যা বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ১৫ শতাংশ। তিনটি ক্যাটাগরিতে তারা ঋণ নিয়েছেন। এসব ক্যাটাগরি হলো- নিজ ব্যাংক থেকে ঋণ, পরিচালক নিজে গ্যারান্টার হয়ে ঋণ বিতরণ এবং সমঝোতার মাধ্যমে এক ব্যাংকের পরিচালকের অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ। অর্থাৎ বিতরণকৃত ঋণ যেকোনভাবে হোক পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণেই থাকছে। এ ছকেই তারা লুটপাট করে থাকেন। সংশোধিত আইন কার্যকর হলে এ ধরনের ঘটনা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

এবিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, এ সিদ্ধান্তের মানে হলো, কতিপয় ব্যবসায়ীর চাপের কাছে সরকারের নতি স্বীকার। এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হলো। তিনি বলেন, এ ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কেন নেয়া হলো তা আমার বুঝে আসে না। এ সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাংকের খেলাপি আরও বাড়বে। পরিচালকরা আরও লুটপাট করবেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ফলে সিদ্ধান্তটি কারও কাম্য ছিল না। তিনি বলেন, শুনেছি বাংলাদেশ ব্যাংকও এর বিরোধিতা করেছিল। এরপরও কার স্বার্থে এ আইন সংশোধন করা হচ্ছে, তা মন্ত্রণালয় ভালো বলতে পারবে। এখন ব্যাংকিং খাতের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা দেখার জন্য অপেক্ষার পালা।